কাছের বন্ধু

সুব্রত হালদার

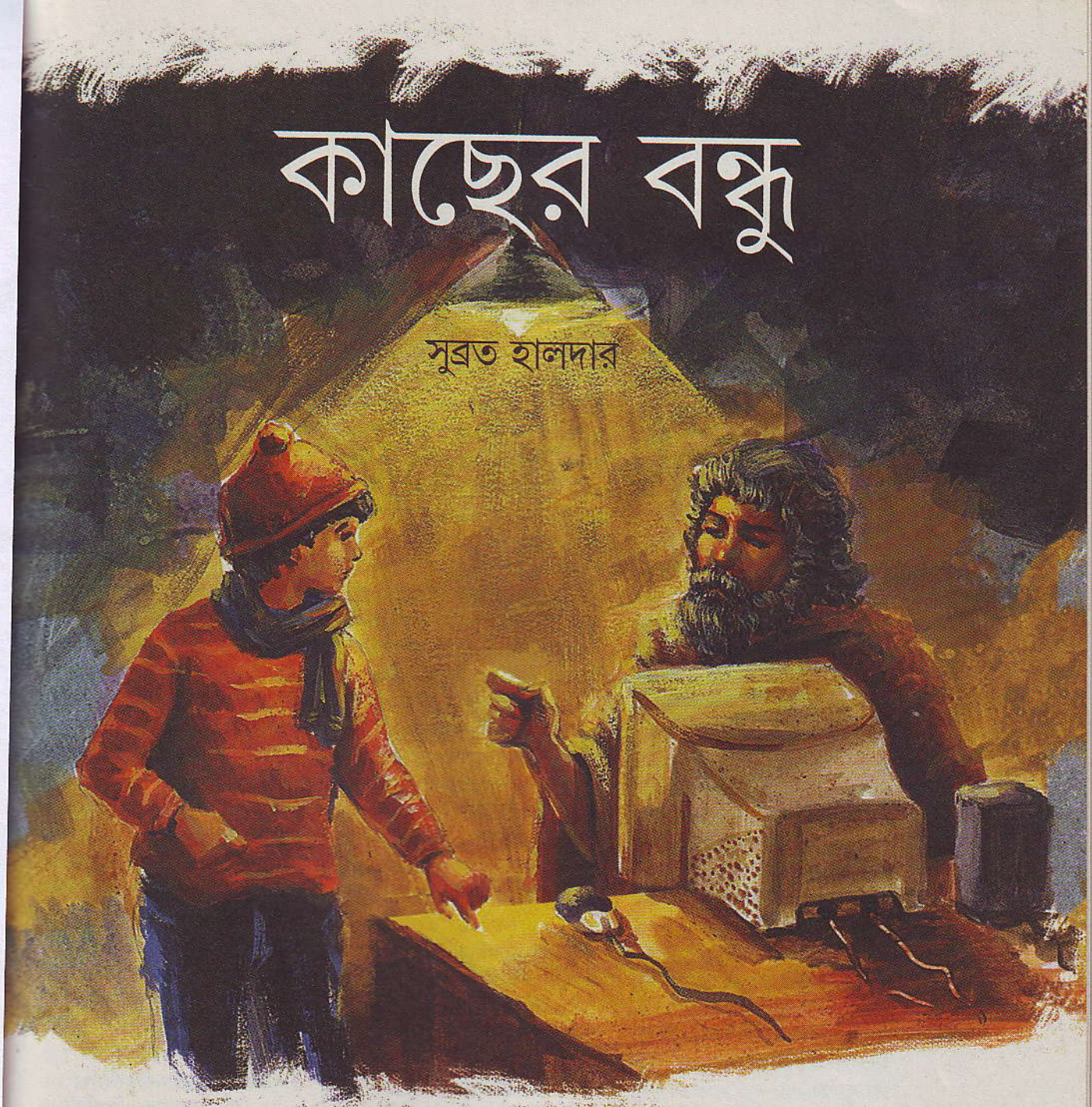

দু'টি বিড়াল দু' মিনিটে দু'টি ইঁদুর খায়। চারটে বিড়াল চার মিনিটে ক'টা ইঁদুর খাবে? এই সহজ প্রশ্নটার উত্তর লিখেছিলাম চার। তা সত্ত্বেও স্যার কেন শূন্য দিলেন, সেটাই মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। এমন সময় পিন্টু দৌড়তে-দৌড়তে এসে খবর দিল, "শুনেছিস, আকাশ ফিরে এসেছে!"

পিন্টু পিংপং বলের মতো উড়ে এসে ঠাঁই করে কথাগুলো ছুড়ে দিয়ে উধাও হয়ে গেল। কখন ফিরে এসেছে? কী করে এসেছে? কিছুই বলল না। সম্ভবত ওর অত সময়ও নেই। আমি ছাড়াও ক্লাসে আরও তেতাল্লিশ জন ছাত্র আছে। খবরটা ও-ই সকলের আগে আমাদের কাছে পৌঁছে দেবে এই প্রতিজ্ঞায় কার্ল লুইসের মতো স্প্রিন্ট টানছে। গোকুলস্যার যে ওকে 'রিপোর্টার' বলে ডাকেন তা এমনি-এমনি নয়। বিড়াল, ইঁদুর সব গোলমাল পাকিয়ে গেল। দৌড়লাম আকাশের বাড়ির উদ্দেশে। আকাশ আমার বেস্ট ফ্রেন্ড। ও ক্লাস ওয়ান থেকেই ফার্স্ট হয়। বিজ্ঞানে এবং অঙ্কে দারুণ। আমি যদিও ওর উলটো মেরুতে, কিন্তু আকাশের সঙ্গে আমার দোস্তিটাই বেশি। তার আর-একটা কারণ, পড়াশোনার বাইরের ব্যাপারে আকাশ আমার কাছে পাত্তা পায় না। খেজুরের ছড়া কতটা হলুদ হলে তবে পাড়ব, তারপর নুন-জলে ভিজিয়ে রেখে ক'টা রাত পরে কালো-কালো পাকা খেঁজুর হবে, সেই অঙ্কটা আমার নখদর্পণে। অথবা গুলতির এক টিপে ফিঙে পাখিকে মগডাল থেকে মাটিতে

ফেলা আমারই কম্ম। তারপর সেটাকে ভিজে ছোলা ও জল খাইয়ে বাঁচিয়ে তুলতে আমিই পারি। আকাশ দর্শক মাত্র। আকাশ তো অবাক হয়ে যায়, টুনটুনির ওড়া-ঘোরা দেখেই কী করে আমি বলি, বাসায় বাচ্চা আছে কি না।

দৌড়তে-দৌড়তে ঢোলা প্যান্টটা কোমর থেকে বারবার খুলে যাচ্ছিল। সেটা গোটাতে-গোটাতে আকাশদের বাড়ির সামনে এসে যখন থামলাম, দেখলাম, দরজায় বেশ বড়সড় একটা জটলা। ঘরের মধ্যেও বেশ কয়েকজন আছে। এতক্ষণে সিন্তু, মিন্তু, বাবুল, হুতম অনেকেই এসে পৌঁছেছে। বড়দের মধ্যে কী সব আলোচনা হচ্ছে। এটা বুঝলাম, আকাশের সঙ্গে আজ আর দেখা হবে না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সকলে মিলে ফুটবল মাঠের দিকে হাঁটতে লাগলাম।

আকাশ প্রত্যেক বছরই মা-বাবার সঙ্গে বেড়াতে যায়। ওর বাবার অফিসের আরও কয়েকজন বন্ধুও যান ফ্যামিলি নিয়ে। এবার সিকিম গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে আকাশ বেপাত্তা। বেপাত্তা হওয়ার খবরটা বিদ্যুৎগতিতে এসে পৌঁছেছিল। তারপর আর কোনও খবরাখবরই পাওয়া যায়নি। পাত্তাই বা কী করে এত দিন পর পাওয়া গেল, তা কে জানে! যেটুকু শুনেছি তা মাস্টারমশাই, দিদিমণিদের আড্ডায় কান পেতে, "সিকিম গিয়েছিস তো ঠিক আছে, কী দরকার বাবা অত রিমোর্টে যাওয়ার...।"

"চারদিকে উগ্রপন্থীদের যা রমরমা তাতে পাহাড়ে না যাওয়াই ভাল...।"

"অত হাই অল্টিচিউডে কতরকমই তো বিপদ হতে পারে। এত বড়-বড় খাদ আছে যে, আলোই পৌঁছয় না। পা পিছলে যদি একবার...।"

বুকটা কেঁপে উঠেছিল। আলোচনার কিছুই ভাল লাগছিল না। আজ আকাশ এসেছে শুনে এত আনন্দ হল যে, আকাশে পাখির মতো ভেসে বেড়ালেও এত আনন্দ হত না।

আকাশ কয়েক দিন ইশকুলেও এল না। হয়তো গুরুতর অসুস্থ। দিনপাঁচেক পর একদিন ইশকুলে ঢুকছি, হঠাৎ আকাশের সঙ্গে দেখা। সবে ভাবছি ওর সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করা উচিত, এমন সময় ও আমার দিকে দৌড়ে এল। আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "লাল্টু, তোর সঙ্গে কতদিন দেখা হয়নি বল তো! বাবা এত ঘাবড়ে গিয়েছেন যে, আমাকে ঘর থেকে বেরোতেই দিচ্ছিলেন না। আজ জোর করে ইশকুলে চলে এলাম।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কিন্তু তোর কী হয়েছিল, হঠাৎ...।"

আকাশ কথার মাঝেই বলল, "কিস্‌সু হয়নি। ওসব পরে বলব। তুই নন্দীবাড়ির ফলসা পেকেছে বলেছিলি। ফলসা খাওয়া।"

"দুর বোকা! ফলসা কি এখন হয়? আশফল খাওয়াব। তবে আগে বল, কোথায় হঠাৎ উধাও হয়ে গিয়েছিলি?"

"সে অনেক কথা। এত অল্প সময়ে কি বলা যায়? পরে বলব। দে, আশফল দে।"

"আশফল নিয়ে কি আমি ইশকুলে এসেছি? তবে বাড়িতে অনেক আছে। এক কাজ কর, আজ বিকেলে খেলার মাঠে না গিয়ে পাঁচিঠাকুরমার বাগানে যাব। ওখানে আমি তোকে আশফল দেব, আর তুই সব কথা খুলে বলবি কিন্তু!"

কথামতো বিকেলে পাঁচিঠাকুরমার বাগানে গিয়ে দেখি, আকাশ আগেই এসে দাঁড়িয়ে আছে। একটা ছোট প্লাস্টিকের ব্যাগে আশফলগুলো রাখা ছিল। ওটা আকাশের হাতে দিলাম। তারপর রামঝুল খেলার ফেভারিট স্পটটার দিকে এগোলাম। লিচু গাছটার ঝুলে পড়া নিচু ডালে বসে আকাশকে বললাম, "এবার বল।"

আকাশ শুরু করল, "গিয়েছিলাম তো সিকিমে। তবে সকলে যেখানে যায় সেই রকম গ্যাংটক, পেলিং বা লাচুং নয়। পেলিং থেকে আরও প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার উত্তরে একটা নির্জন জায়গায়। জায়গাটার নাম চাংটু। ওখানে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের একটা বাংলো আছে। বিশেষ পারমিশন নিলে দশ-বারোজন থাকা যায়। বাবার এক বন্ধুই সব ব্যবস্থা করেছিলেন।"

আকাশ আশফল ছাড়ানোয় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ওর হাত থেকে কয়েকটা আশফল নিয়ে বললাম, "দে, আমি ছাড়িয়ে দিচ্ছি, তুই থামবি না কিন্তু। বলে যা।"

আকাশ টপ করে কয়েকটা ছাড়ানো আশফল মুখে ফেলে বলল, "কত দূর পর্যন্ত বললাম যেন?"

বিরক্ত হয়ে বললাম, "দুর, কী রে, এখনও তো আসল ঘটনা শুরুই হয়নি। চাংটু।"

"হ্যাঁ চাংটু। গেস্টহাউসের চারদিকে উঁচু-উঁচু পাহাড়। পুরোটাই বরফে ঢাকা। বাবা, মা, আঙ্কল, আন্টিরা তো গেস্টহাউসের বারান্দায় বসে 'হাউ ওয়ান্ডারফুল' বলে সময় কাটাচ্ছেন। সত্যি কথা বলতে, প্রথম দিন আমারও ভাল লাগল। তারপর থেকে আর সময় কাটে না। শুনলাম নাকি, সাত দিন ওই গেস্টহাউসেই থাকতে হবে।"

"আবার থামলি কেন, বল।"

"বলছি, বলছি। কয়েকটা আশফল এত পানসে কেন রে?"

"ওগুলো নিশ্চয়ই কাঁচা অবস্থায় পেড়েছিলাম। ঠিক মজেনি। তুই বল না। তারপর?"

"তারপর অবশ্য গুরুং-এর সঙ্গে আমার দারুণ বন্ধুত্ব হয়ে গেল।"

"গুরুংটা আবার কে?"

"ও, গুরুং হল ওই গেস্টহাউসের কেয়ারটেকার। রান্নাবান্না করা থেকে গেস্টহাউসের সব দায়িত্বই ওর উপর। বড়রা নিজেদের মতো থাকতেন, আর আমি গুরুংয়ের সঙ্গে গল্প করেই সময় কাটাতাম।"

"কী গল্প করতিস? ওর ভাষা বুঝতিস?"

"গুরুং তো সুন্দর বাংলা বলে। এক সময় কলকাতাতেই কী একটা কাজ করত। ওর সঙ্গে নানারকম গল্প করতাম। ওখানে নাকি এক সময় ইয়েতিরা থাকত। সকালে উঠে ঝুরো বরফের উপর ইয়েতিদের ইয়া বড়-বড় পায়ের ছাপ দেখা যেত। এক সময় নাকি হোয়াইট বিয়ারেরও দেখা পাওয়া যেত।"

"হোয়াইট বিয়ার আবার কী রে?"

"ও মা, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকে দেখিসনি? অনেকটা পোলার বিয়ারের মতো।"

"ও বুঝেছি, বুঝেছি। তারপর কোথায় হারিয়ে গেলি। তাড়াতাড়ি বল, এর পর সন্ধে হয়ে যাবে। আর শোনা হবে না।"

"বলছি, বলছি।" আকাশ চার-পাঁচটা আশফল মুখে ফেলে গালের এক দিকটা টোপলা করে রাখল। "একদিন গুরুংকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এখানে পরিরা আসে?'

"গুরুং চোখ বড়-বড় করে বলল, 'আসে না আবার! আমি কতবার

গল্প

দেখেছি!'

"আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কেমন দেখতে পরিদের?'

"গুরুং বলল, 'দারুণ সুন্দর দেখতে। টানা-টানা চোখ। ঝলমলে পোশাক, প্রজাপতির মতো দু'টো সুন্দর পাখনা।'

"গুরুংয়ের কথা শুনে আমার তাক লেগে গেল। ওকে বললাম, 'কই আমি তো দেখলাম না?'

"গুরুং হাসতে-হাসতে বলল, 'পরিরা কী এখানে আসবে? ওদের দেখতে গেলে আরও উত্তরে যেতে হবে।' গুরুং রান্নাঘরের জানলা দিয়ে দূরে পাহাড়টার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ওইখানে আসে। ওই পাহাড়টার সামনে একটা সুন্দর সবুজ মাঠ আছে। রোজ বিকেলবেলা ওরা দলবেঁধে ওখানে খেলা করে।'

"গুরুংকে বললাম, 'আমাকে ওখানে নিয়ে যাবে?'

"গুরুং বলল, 'একদম নয়। ওরা একবার মানুষের দেখা পেলে আর ওখানে আসবে না। আরও উত্তরে চলে যাবে। মানুষকে ওরা খুব ভয় পায়।'

"গুরুংয়ের কথা আমার বিশ্বাস হল না। পরিরা আমার মতো একটা ছোট ছেলেকে দেখলেও ভয় পাবে? তবে যে বইয়ে পড়েছি, পরিদের সঙ্গে ছোটদের কত বন্ধুত্বের কথা। মনে-মনে ঠিক করলাম গুরুংয়ের সঙ্গে নয়, আমি একলাই যাব। পরের দিন দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর বড়রা যখন বিশ্রাম নিতে ঘরে গেলেন, আমি বায়না ধরলাম, গেস্টহাউসের সামনে ঢালু জমিটায় খেলব। জায়গাটা তারকাঁটা দিয়ে ঘেরা বলে বড়রাও আপত্তি করলেন না। তারপর যখন দেখলাম, কেউ আমাকে দেখছে না, তখন পাহাড়টার দিকে হাঁটতে লাগলাম। পাহাড়টাকে দেখে মনে হল, কতক্ষণ আর লাগবে। বিকেলের আগেই ওখানে পৌঁছে যাব। তারপর কোনও ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থেকে পরিদের দেখেই দৌড় লাগাব। সন্ধে নামার আগেই আবার ফিরে আসব।"

আমি উৎকণ্ঠা চেপে রাখতে না পেরে বললাম, "পরিদের দেখা পেলি?"

আকাশ বলল, "আমি তোর কথামতো এক নাগাড়েই বলে যাচ্ছিলাম, এবার কিন্তু তুই থামালি।"

"ঠিক আছে বাবা, আর ডিস্টার্ব করব না, তুই বল।"

"আশফলগুলো ভাল নয়। একেবারে পানসে। ঠিকমতো পাকেনি।"

"বলছি তো, কাল তোকে একেবারে পাকা আশফলই দেব। অনেক নইল ফলও বাড়িতে আছে। টক-মিষ্টিতে জমবে ভাল। এখন বল, পরিদের সঙ্গে কী কথা হল?"

আকাশ মুখ বাঁকিয়ে বলল, "পরি না ছাই! ওখানে পৌঁছে দেখি, সব ভোঁ-ভাঁ। শুধু বরফ আর বরফ। ততক্ষণে সূর্যটা পাহাড়ের মাথায় এসে পৌঁছেছে। গেস্টহাউসে ফেরার জন্য তাড়াতাড়ি পা চালালাম। কিন্তু দেখতে না- দেখতেই সূর্যটা পাহাড়ের আড়ালে ডুব দিল, আর ঝপ করে সন্ধে নেমে এল। আমাদের এখানকার মতো নয়। ওরকম আলো ঝলমল বিকেলে ঝপ করে সন্ধে নামবে কী করে বুঝব বল।"

"তোকে বুঝতে হবে না। তারপর কী হল বল।"

"তারপর তো ভয়ে আমার পা চলছে না। চারদিকে হাড়হিম করা ঠান্ডা। অন্ধকারে ফেরার পথটা কোন দিকে সেটাও গুলিয়ে গেল।"

"তারপর?" টেনশনে আমারও শিরদাঁড়া সোজা হয়ে গেল।

আকাশ মুখটা উঁচু করে বলল, "দ্যাখ, চারদিকে কেমন আলো কমে এসেছে। এখানেও যদি ঝপ করে সন্ধে নামে! বাবা বলেছেন, সন্ধের আগেই বাড়ি ফিরে আসতে। চল, আজ পালাই। বাকিটা কাল বলব।"

আকাশের উপর রাগে শরীরটা রি রি করে উঠল। ঠিক টিভি সিরিয়ালের মতো। যখনই কোনও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটতে যাবে, হয় বিজ্ঞাপনের বিরতি, নয় আসছে সপ্তাহে। ইতিমধ্যে আকাশ বাড়ির দিকে দৌড়তে শুরু করেছে। অগত্যা আমিও হাঁটতে লাগলাম। আজকের রাত্তিরটা আকাশের হাড়হিম করা রাতের চেয়েও বাজে কাটবে সেটা বেশ বুঝতে পারছি। রাতটা কোনওমতে কাটল। পরের দিন স্কুলে গিয়েও নাজেহাল অবস্থা। আকাশ যেখানে শেষ করল, তার পরেও কি হোমওয়ার্ক-এ মন বসে! কোনওমতে স্কুলের সময়টা পার করেই দৌড়লাম পাঁচিঠাকুরমার বাগানে। এক পকেটে আশফল ও আর-এক পকেটে নইল ভর্তি করে পৌঁছে দেখি, আকাশ তখনও আসেনি। অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়ল। মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করে নিলাম, আজ আর কোনও কথাই বলব না। আকাশ আশফল আর নইলগুলো কোচড়ে নিয়ে বসে বলল, "কত পর্যন্ত বলেছিলাম যেন?"

"ওই যে হাড়হিম না কী সন্ধে...।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। মিনিটপাঁচেক আন্দাজমতো এগোতেই দেখলাম, আকাশে তারা ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তখন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কাঁদা ছাড়া আমার আর কোনও গতি নেই। হঠাৎ চোখে পড়ল দূরে জঙ্গলের মধ্যে টিমটিম করে একটা আলো জ্বলছে। মনে পড়ে গেল, গুরুং এক সাধুবাবার কথা বলেছিল। এই দিকে থাকেন। গুরুংয়ের মুখে সাধুবাবার কথা শুনে বেশ ভয়ই করেছিল। কিন্তু ভাবলাম, এখানে সারারাত দাঁড়িয়ে থাকলে ঠান্ডায় জমে মরে যাব। ওই সাধুবাবার কাছে গেলে বাঁচলেও বেঁচে যেতে পারি। ভয়ে-ভয়ে আলো লক্ষ করে এগোলাম। আলোর ওখানে পৌঁছে দেখলাম, একটা ছোট কাঠের বাড়ি। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা ছোট ইলেকট্রিক বাল্ব জ্বলছে। এই জঙ্গলে ইলেকট্রিক বাল্ব দেখে একটু অবাকই হলাম। কারণ, আশপাশে, এমনকী আমাদের সরকারি গেস্টহাউসে ইলেকট্রিক নেই। ঘরে একটা টেবিলের উপর কম্পিউটারের মনিটরের মতো কিছু একটা রাখা। মনিটরে আদিম কালের মানুষের মতো দেখতে কয়েকটা লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে। সম্ভবত সিনেমাটিনেমা হবে। আর তার সামনে সাধুবাবার মতো দেখতে একজন বসে আছেন। লোকটির লম্বা দাড়ি, কাঁচাপাকা লম্বা চুল, একটা ঢিলেঢালা পোশাক পরা।"

"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো," বলেই জিভ কাটলাম। "ঠিক আছে তুই বল। আমি আর ডিস্টার্ব করব না।"

সুযোগ পেয়ে আকাশও অন্য প্রসঙ্গে এল, "তোর আজকের আশফলগুলো জম্পেশ! মুড এসে গিয়েছে।"

"তুই বল না। বাজে কথা বাড়াচ্ছিস কেন?"

"বলছি তো। তুই তো বাধা দিলি। আবার আমাকে দোষ দিচ্ছিস?"

"ঠিক আছে, কথা দিচ্ছি, আমি আর কোনও কথা বলব না।"

আকাশ আবার বেশ কয়েকটা আশফল একসঙ্গে মুখের মধ্যে পুরে শুরু করল, "দেখতে অনেকটা ওই রকম। কিন্তু বেশ ছোটখাটো রোগাপাতলা চেহারা। সাধুটি আমার পায়ের শব্দে পিছন ফিরে তাকালেন, আমাকে দেখে চমকে উঠে বললেন, 'তুমি, কে তুমি?'

"আমি ভয়ে-ভয়ে বললাম, 'আমি আকাশ। পথ হারিয়ে ফেলেছি।'

"তিনি আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'ভিতরে এসো! তা তুমি এখানে কোথায় এসেছিলে যে, পথ হারিয়ে ফেলেছ?'

"আমি সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। ততক্ষণে সাধুটিকে দেখে মনে সাহস এল যে, তাঁর খারাপ কোনও মতলব নেই। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কে?'

"তিনি বললেন, 'আমি ডক্টর বি মুখার্জি। তুমি চিনবে না। তবে তোমার বাবা চিনলেও চিনতে পারেন।'

" 'তার মানে আপনি কি বিখ্যাত কেউ...?'

"সাধুটি হাসলেন, 'বিখ্যাত বা কুখ্যাতও বলতে পার। তোমাদের কলকাতায় নামী একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে রিসার্চ করতাম। কিন্তু আমার চিন্তাভাবনা শুনে আমার কলিগদের সন্দেহ হয়, আমি বোধ হয় পাগল হয়ে গিয়েছি। তার উপর কখনও-কখনও সারাদিন সারারাত ল্যাবরেটরিতেই পড়ে থাকতাম। কখনও আবার দিন দশ-বারো সব কাজ ছেড়েছুড়ে আড্ডা মেরেই কাটিয়ে দিতাম। আমার কাজকর্মে অতিষ্ট হয়ে শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ আমাকে তাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল। তার আগেই আমি ফুট।' তিনি হাসতে-হাসতে বললেন, 'প্রথমে ছিলাম ডক্টর বিকাশ মুখার্জি। পরে কলিগরা নামটা একটু পালটে আড়ালে আবডালে ডাকত 'ডক্টর বাতিল মুখার্জি'।'

"আমি কী বলব বুঝতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলাম। সাধুটি হাসি থামিয়ে বললেন, 'এই দ্যাখো আমার কাণ্ড। অনেক দিন পরে কথা বলার লোক পেয়ে কী সব আবোল তাবোল বকে যাচ্ছি। তুমি তো ঠান্ডায় কাঁপছ। এই নাও, এটা গায়ে দাও!' বলে তিনি নিজের গায়ের কম্বলটা খুলে আমার গায়ে জড়িয়ে দিলেন।

"টেবিলের পাশের খাটটায় বসে বললাম, 'দাদু, তুমি এখানে কী করো?'

"সাধুটি কেমন উদাস হয়ে গেলেন। দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে দু' হাত উপরে তুলে পাল্লা দু'টো ধরে কিছুক্ষণ অন্ধকারের তাকিয়ে থাকলেন। তারপর নিজের মনেই বললেন, 'কী সুন্দর করে ওকে গড়েছ। কী সুন্দর ডাক, 'দাদু'। কী সরল, নির্মল! এই রকম একটা নির্মল মনই তো আমার সব সমস্যার সমাধান করতে পারে।' তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, 'আমি এখানে রিসার্চ করছি আকাশ। তোমার আকাশ নামটা বড্ড বড়। ডাকনাম কিছু নেই?'

" 'হ্যাঁ আছে, নীল।'

"সাধুটি আবার উদাস চোখে স্বগতোক্তি করলেন, 'বাঃ, কী সুন্দর তোমার খেলা। এই নীল আকাশের বুকেই আমার রিসার্চের আদর্শ জায়গা। আর নীল আকাশই আমার কাছে এসে হাজির আমার সাধ্যের অতীত সিদ্ধান্তের সমাধান করতে।' আমার দিকে ফিরে বললেন, 'তুমি আমাকে 'দাদু' বলেই ডাকবে, কেমন!'

"কথা বলতে-বলতে মনিটরের দিকে আমার চোখ পড়ল। দেখলাম, আদিম মানুষদের মতো দেখতে কয়েকজন বল্লমের মতো সুচলো লম্বা লাঠি নিয়ে একটা শিয়ালের মতো জন্তুর পিছনে তাড়া করছে। তারপর জন্তুটাকে মেরে লাঠির মাথায় ঝুলিয়ে ফিরে আসছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি সিডিতে সিনেমা দেখছ? বেশ মজার লাগছে। তবে ছবিগুলো বড্ড অস্পষ্ট। আমাদের বাড়ির টিভিতে কিন্তু বেশ পরিষ্কার ছবি আসে।'

"দাদু হাসলেন, আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ছবি না। এইখানে আজ থেকে কয়েকশো বছর আগে যা ঘটেছে তাই দেখছি। সব সত্যি ঘটনা।'

" 'ধ্যাত! তা আবার হয় নাকি?'

"দাদু বললেন, 'কেন হবে না। তার আগে বলো তুমি কোন ক্লাসে পড়ো?'

"আমি চটপট জবাব দিলাম, 'ক্লাস ফোর।'

" 'তা হলে তোমার পক্ষে বোঝা একটু কঠিন হবে। তা হলেও সহজ করে বললে কিছুটা বুঝতে পারবে।'

"দাদুর কথায় বুঝলাম যে, দাদু মজা করছেন না। কিছু একটা রহস্য নিশ্চয়ই আছে। বললাম, 'বলোই না শুনি!'

"দাদু বললেন, 'আয়না দেখেছ?'

" 'হ্যাঁ, কেন দেখব না। আমাদের বাড়িতে বেশ কয়েকটা আছে।'

"দাদু টেবিল থেকে তুলে একটা আয়না আমার মুখের সামনে ধরে বললেন, 'কী দেখছ?'

" 'কেন, আমার মুখ!'

" 'কী করে দেখছ, সেটা বলো তো।'

" 'সামনে বসে আছি বলে।'

"দাদু হাসতে-হাসতে বললেন, 'তা না। আসলে তোমার মুখ থেকে আলো বের হয়ে আয়নায় রিফ্লেক্টেড হয়ে আবার তোমার চোখে আসছে। তাই না?'

" 'হ্যাঁ, তাই। সেটাও আমি জানি।'

" 'বাঃ, গুড বয়। তা হলে এবার বলো, আজ থেকে কয়েকশো বছর আগে পৃথিবীতে যেসব ঘটনা ঘটেছে বা আজ যা হচ্ছে সেই সব আলো বা ছবিগুলো আকাশের দিকে গিয়ে কোথায় যাচ্ছে?'

"ব্যাপারটা আমার কাছে জটিল হয়ে গেল। বললাম, 'তা তো জানি না!'

"দাদু বেশ গম্ভীর হয়ে গেলেন, 'সেগুলো কি কোনও আয়নায় রিফ্লেক্টেড হয়ে ফেরত আসতে পারে না?'

" 'পারে, তবে অত বড় আয়না কোথায়?'

"দাদু অস্থির হয়ে পায়চারি করতে-করতে বললেন, 'তুমি যে প্রশ্ন করছ, ওই পঞ্চাশ-ষাট বছরের বৃদ্ধরাও আমাকে এই একই প্রশ্ন করত। আমি কিন্তু বলতাম, অত বড় আয়না আছে। কেউ আমার কথা বিশ্বাস করত না। সেই কারণেই না আমি বাতিল মুখার্জি হয়ে গেলাম। আরে ভাই, দু' পাতা পড়লেই বিজ্ঞানী হওয়া যায় না। ইমাজিনেশন! কল্পনা! কল্পনা করার ক্ষমতা থাকা চাই। কল্পনার সাগরে খড়কুটোর মতো ভাসতে হবে। তবেই না...।'

"আমার উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। বেশ বুঝতে পারছি, দাদুর কথায় একটা সত্যি লুকিয়ে আছে। তার প্রমাণ তো সামনেই দেখতে পাচ্ছি। দাদুর কথার মাঝেই বললাম, 'বলো না, কোথায় সেই আয়না?'

"দাদু পায়চারি থামিয়ে চেয়ারটায় বসলেন, 'বলছি, বলছি। যদিও জানি তুমি

বুঝবে না, তা হলেও বলছি। আমার বিজ্ঞানী বন্ধুরাই বুঝল না, আর তুমি তো মাত্র ফোরে পড়ো। তবে জানো তো, কিছু কথা বলেও শান্তি। মনটা হাল্‌কা হয়।'

" 'আগে বলো কোথায় সেই আয়না?'

" 'অনেক দূরে। গ্যালাক্সি কী জানো? জানো না। এই মহাবিশ্বে কোটি-কোটি গ্রহ-নক্ষত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার সব ক'টাতেই ঠিক আমাদের পৃথিবীর মতো না হলেও, নানা রকম আবহাওয়া আছে। আর যে-কোনও দু'টি আবহাওয়া বা মাধ্যমের সংযোগস্থলই হল এক-একটা আয়না। প্রকাণ্ড আয়না। যেমন ধরো, বাতাস ও জল। শূন্য ও বাতাস। আলো একটা থেকে আর-একটায় ঢোকে আর তার কিছু অংশ রিফ্লেক্ট করে। কখনও বা পুরোটাই রিফ্লেক্টেড হয়ে ফিরে আসে। বুঝলে কিছু?'

" 'একটু-একটু বুঝলাম। তোমার কথা যদি ঠিক হয় তবে তো বিরাট আয়নায় রিফ্লেক্টেড হয়ে এখনকার ছবিই ফিরে আসত। কয়েকশো বছরের পুরনো ছবি কেন?'

"দাদু হাসলেন, 'শোনো তবে আর-একটু গভীরে যাই। আলো তো মাত্র সেকেন্ডে কয়েক লক্ষ কিলোমিটার বেগে চলে। আর ওই এক-একটা গ্যালাক্সি এত দূরে যে, আলো ওখানে পৌঁছে ফিরে আসতে কয়েক বছর থেকে কয়েক লক্ষ বছর লেগে যায়। আমি তো মোটে একশো বছর দূরের গ্যালাক্সিকে ফোকাস করেছি। তাই দু'শো বছর আগের ছবি দেখছি। আরও দূরের বা কাছের গ্যালাক্সিকে ফোকাস করলে কয়েক বছর থেকে কয়েক লক্ষ বছর আগের ঘটনাও তোমার চোখের সামনে ভেসে উঠবে।'

" 'এ তো দারুণ ব্যাপার! তবে বাবা যা বলেন সেটাই ঠিক।'

"দাদু চমকে উঠলেন, 'তোমার বাবা কী বলেন?'

" 'বাবা মাঝে-মাঝেই মাকে বলেন, ছোটদের আন্ডার এস্টিমেট কোরো না। আমরা যা ভাবি ওরা কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি বোঝে। আমি সবটাই বুঝতে পারছি। তুমি নিশ্চয়ই দারুণ টিচার ছিলে। সিম্পল!'

"দাদু একটু দম নিয়ে বললেন, 'যতটা সিম্পল মনে হচ্ছে, আদপে ততটা সিম্পল নয়। কারণ, যে সামান্য আলো ফিরে আসে তা আমাদের চারদিকের এত আলোর মাঝে সিন্ধুতে বিন্দুর সমান। তবে আর-একটা জিনিস হয়। এত রকমের মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে যেতে-যেতে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের কিছু পরিবর্তন হয়ে যায়। সেই জন্যে ওটাকে আমার যন্ত্র আলাদা করে ধরতে পারে। তা না হলে কিছুই সম্ভব ছিল না।'

"দাদু বসে পড়লেও উত্তেজনায় আমি লাফিয়ে উঠলাম। 'আচ্ছা দাদু, তার মানে ঠিকঠাক জায়গায় এই যন্ত্র বসিয়ে ঠিক-ঠিক ফোকাস করলে আমরা পলাশির যুদ্ধও দেখতে পাব বা ব্রাডম্যানের সেই দারুণ সেঞ্চুরিগুলো, যার কোনও ভিডিও রেকর্ডিং নেই।'

" 'সব, সবই সম্ভব। সেটাই তো দুঃশ্চিন্তার কারণ। আরও অনেক কিছুই সম্ভব, যার পরিণামও ভয়ংকর হতে পারে।'

" 'সেগুলো কী?'

" 'ধরো, গত একশো বছরে ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টে যে কয়েক হাজার মানুষ মারা গিয়েছে, তার জন্য কে বা কারা দোষী? দু'টো বিশ্বযুদ্ধ লাগিয়ে কয়েক লক্ষ মানুষকে মারার পিছনে কারা কলকাঠি নেড়েছিল? আমরা কি পারব মৃতদের ফিরিয়ে আনতে? আর যারা দোষী তাদের কি পারব আমরা শাস্তি দিতে? এই ভাবনাগুলোই আমাকে ভাবাচ্ছে। একবার আবিষ্কারটার কথা জানাজানি হয়ে গেলে তো দাবি উঠবে অতীতের সবকিছু আর-একবার যাচাই করার। সেটা কি ঠিক হবে?'

" 'ঠিক নয় বলছ?'

" 'ঠিক না বেঠিক সেই সিদ্ধান্তটাই তো অনেক দিন ধরে নিতে পারছি না। আমার ঝানু মাথায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। তুমিই একমাত্র এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে পার।'

" 'আমি! আমি কী করে?'

" 'তার জন্য তোমাকে কিছু করতে হবে না। আমি শুধু তোমাকে দু'টো প্রশ্ন করব। তুমি সরল মনে ভেবেচিন্তে তার উত্তর দিলেই আমি আমার সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাব।'

" 'এ তো সোজা। শুনি প্রশ্ন দু'টো কী?'

" 'তবে শোনো। প্রথম প্রশ্ন, তোমার সবচেয়ে প্রিয় কে?'

স্বর্ণাক্ষরে ছোটদের বই

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের
বকবকম
পাতায় পাতায়
মজার ছবি।
১৫ টাকা

মহাশ্বেতা দেবীর আশ্চর্য বই
তুতুল ২৫ টাকা

কানাইলাল চক্রবর্তীর
খুব ছোটদের জন্য এক আশ্চর্য সুন্দর বই
চলো দেখে আসি
শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত
১৫ টাকা
লেখকের আরেকটি বই চড়ুইয়ের সঙ্গে ১৫ টাকা

মৈত্রেয়ী নাগের
বাঘ বেড়ালের
ছড়া ছবি
৩০ টাকা

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ছোটদের বই

আমাজনের জঙ্গলে
আমাজন ঘুরে এসে লেখা বিস্ময়কর কিশোর উপন্যাস। চতুর্থ মুদ্রণ। ৪০ টাকা
'গল্পের সঙ্গে সঙ্গে এত সত্য কথা যাতে আছে, সেই বইটি ভারতের নানা ভাষায় অনুবাদ হোক। সকল ভাষার শিশুরা পড়ুক।'—মহাশ্বেতা দেবী, আজকাল।

পাগল করা ছন্দে দম বন্ধ করা ডাকাতের গল্প

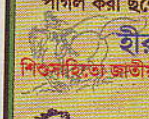

হীরু ডাকাত
শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত
৪৫ টাকা

শাদা ঘোড়া
ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট কর্তৃক বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় পর্যায়ক্রমে অনূদিত হচ্ছে। ১৫ টাকা

ঋষিকুমার
ডাকাত, ছেলেধরা, বেদে, বাঁশিওয়ালার সঙ্গে নানা রোমাঞ্চকর অভিযান।
২০ টাকা

গৌর যাযাবর
বিশ্বভারতীর আশালতা সেন পুরস্কারপ্রাপ্ত। ৪০ টাকা

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
ছোটদের নতুন বই
ছেঁড়াকাঁথার গল্প
দুই মলাটের মধ্যে পাঁচ পৃথিবীর পাঁচটি গল্প। ৫০ টাকা

লেখকের ছোটদের আরও বই
পাখির খাতা ২০ টাকা টিয়াগ্রামের ফিঙেনদী ১৫ টাকা
তালগাছের ডোঙা ২০ টাকা আমার বনবাস ১২ টাকা
হরিণের সঙ্গে খেলা ১৫ টাকা

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩,
বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট) ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাবেন
কমপক্ষে ২০০ টাকার বইয়ের অর্ডার দিলে আমাদের খরচে আপনার ঠিকানায় বই পাঠিয়ে দেওয়া হবে। টাকা পাঠাবেন এই ঠিকানায়:
Swarnakshar Prakasani Private Limited
29/1A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-19 Ph: 2283-2320

" 'এ মা, এ তো সোজা প্রশ্ন।' বলেই বুঝলাম যতটা সোজা মনে করেছিলাম ততটা সোজা নয়। একবার মনে হল বাবা, আবার অন্য মুখগুলোও মনে আসতে থাকল। মা, ছোটকা, শিউলি। সবচেয়ে প্রিয় কে? গুলিয়ে যেতে লাগল।

"দাদু বললেন, 'তাড়া নেই। ভেবেচিন্তে উত্তর দেওয়ার অনেক সময় আছে। চলো, অনেক রাত হল। অল্প কিছু খাবার আছে। দু'জনে মিলে খেয়ে শুয়ে পড়ি। কাল সকালে উত্তরটা দিও, আর আমি তোমাকে তোমাদের গেস্টহাউসের ধারেকাছে পৌঁছে দিয়ে আসব।'

"খাওয়াদাওয়া শেষ করে ছোট খাটটায় আমি শুয়ে পড়লাম। দাদু মেঝেয় একটা চাদর পেতে শুয়ে পড়লেন। কিছুতেই চোখে ঘুম আসছে না। বাবা-মা নিশ্চয়ই আমাকে খোঁজাখুঁজি করছেন। হঠাৎ দাদুর প্রশ্নটা মনে পড়ে গেল। আমার সবচেয়ে প্রিয় কে! প্রথমেই মা'র কথা মনে হল। তবে যুক্তির দিক থেকে দেখলে বাবার কথাই বলতে হয়। কারণ, বাবা আমাকে নিয়ম করে পড়ান। অফিস থেকে ফেরার পথে ভাল-ভাল জিনিস এনে দেন। অন্যদিকে মা প্রায় সারাদিনই বকাঝকা করেন। কেন পড়তে বসতে দেরি হচ্ছে? স্কুল ড্রেসটা নোংরা করেছি কেন? দুধটা পুরো খাইনি কেন? মা'র বকা সারাদিনই চলছে। ছোটকাও তো আমার খুব প্রিয়। বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, গল্প শোনানো। আম গাছের ডালে দোলনা বেঁধে দেওয়া। এমনকী খুঁজে-খুঁজে পেয়ারা ডাল কেটে গুলতি তৈরি করে দেওয়া। যত কিছু আমার পছন্দের, ছোটকাই তো করে। আর মামাতো বোন শিউলি তো এমনিতেই আমার সবচেয়ে প্রিয়। কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারলাম না। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি টেরও পাইনি। সকাল হতেই দেখি, দাদু চেয়ারটায় বসে মনিটরের দিকে একনজরে তাকিয়ে আছেন। আমার দিকে চোখ পড়তে হঠাৎ বললেন, 'কোনও চিন্তা করতে পারবে না। আমার তিন গোনার সঙ্গে-সঙ্গে বলো তোমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় কে? এক, দুই...'

"আমার মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে এল, 'মা।'

"দাদু বললেন, 'তাড়াতাড়ি উঠে হাতমুখ ধুয়ে নাও। ব্রেকফাস্ট রেডি। ব্রেকফাস্ট সেরেই আমাদের রওনা দিতে হবে। ওদিকে তোমার বাড়ির লোকেরা নিশ্চয়ই খোঁজাখুঁজি শুরু করেছেন।'

"দাদুকে বললাম, 'কিন্তু তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নটা তো শোনা হল না?'

" 'হবে, হবে। ব্রেকফাস্ট করে, যেতে-যেতে বলব।'

"ব্রেকফাস্ট করতে-করতে দেখলাম, মনিটরটায় কোনও ছবি নেই। দাদুকে বললাম, 'কী হল, তোমার যন্ত্রপাতি খারাপ হয়ে গেল নাকি! কোনও ছবি আসছে না।'

"দাদু বললেন, 'তা নয়, একটু আগেই দেখছিলাম সুন্দর দৃশ্য। ঘন অন্ধকারের মধ্যে একটা আগুন জ্বলছে। সকালে শিকার করে আনা জন্তুটাকে ওরা পোড়াচ্ছে। চারদিকে সকলে গোল হয়ে বসে। তারপর মিলেমিশে ওই পোড়া মাংস ভাগ করে খেল। এখন রাত্রি, তাই কোনও আলো নেই। আবার কয়েক ঘণ্টা পর সকালের ছবি ধরা পড়বে।'

"ব্রেকফাস্ট সেরে দাদুর সঙ্গে রওনা হলাম। দাদুকে ছেড়ে যেতে মনখারাপ করছে। আবার বাবা-মা'র কথাও মনে পড়ছে। দাদু যেতে-যেতে বললেন, 'ধরো, তোমাকে একটা সিডি দিলাম। সিডিটায় তোমার মা একজনকে খুন করেছিলেন সেই ছবি তোলা আছে।'

"দাদুর উপর রাগ হয়ে গেল। দাঁড়িয়ে পড়ে বললাম, 'আমার মা কাউকে খুন করতে পারেন না। আমার মা একটা আরশোলা দেখলেও তাড়িয়ে দেন, মারেন না, এই কথা কখনও বলবে না।'

"দাদু মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'দুর বোকা, আমি বলছি নাকি সত্যি। বললাম তো ধরো, অর্থাৎ কল্পনা করো। তা হলে তুমি কি সেই সিডি চালিয়ে দেখবে?'

" 'না, একদমই নয়। ওই সব বাজে সিডি দুমড়েমুচড়ে এমন জায়গায় ফেলে দেব যাতে কেউ কোনও দিন খুঁজে না পায়।' দাদু কিছুক্ষণ চুপ করে আমার সঙ্গে হাঁটলেন। দাদুকে বললাম, 'কী হল, কী প্রশ্ন করবে বলেছিলে, করলে না তো?'

"দাদু মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'প্রশ্ন তো করা হয়েই গিয়েছে। উত্তরও পেয়ে গিয়েছি। সবচেয়ে মজার কী জানো, গত কয়েক বছর ধরে চিন্তা করেও আমি যে সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি, আজ তোমার উত্তর আমাকে মুহূর্তের মধ্যে সঠিক সিদ্ধান্ত কী, তা জানিয়ে দিল। তুমি যে আমার কী বিরাট উপকার করলে! শুধু আমার কেন, গোটা মানবজাতির বিরাট একটা উপকার করলে।'

" 'সিদ্ধান্তটা কী?'

" 'শুনবে? আমি আমার এই আবিষ্কার ধ্বংস করে ফেলব। পৃথিবীতে কেউ কোনও দিন এই আবিষ্কারের কথা জানতে পারবে না।' দাদুর গলাটা অন্য রকম শোনাল। দাদুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, চোখটা জলে ভরে রয়েছে। দাদু গেস্টহাউস পর্যন্ত এলেন না। আমাকে দূর থেকে দেখিয়ে বললেন, 'এই রাস্তায় মিনিট কয়েক হাঁটলেই সোজা গেস্টহাউসে পৌঁছে যাবে। পথে তোমার বাড়ির লোকদের সঙ্গে দেখা হয়েও যেতে পারে। ওঁরা নিশ্চয়ই তোমাকে খোঁজাখুঁজি করছেন।'

"দাদুকে বললাম, 'আর আমাদের দেখা হবে না?'

"দাদু গালে আলতো করে হাত বুলিয়ে বললেন, 'সম্ভবত হবে না। আর-একটা কথা, কোথায় ছিলে বাড়ির লোকজন জিজ্ঞেস করলে আমার কথা বোলো না। বোলো, একজন সন্ন্যাসীর ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলে।'

" 'সে কী! এত বড় একটা ঘটনা কাউকেই বলব না?'

"দাদু মুহূর্তের মধ্যে কিছু একটা ভাবলেন। বললেন, 'দ্যাখো, আমরা বৃদ্ধেরা কেমন স্বার্থপর হয়ে যাই। তুমি আমার এত বড় একটা উপকার করলে, আর আমি তোমার নরম মনে একটা পাথর চাপিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, একজনকে বলতে পার।'

" 'সেই একজন কে?'

" 'যে তোমার কাছের বন্ধু, তাকে!' "

ছবি: সঞ্জীবন বসু

হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডার সেন-এর সম্পূর্ণ জীবনী সহ তাঁর ১২টি গল্পের একরঙা ও রঙিনচিত্র সম্বলিত অসামান্য অনুবাদ

অপরূপ রূপকথা

অনুবাদক : মৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ • দাম : ১০০ টাকা

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস

৯৩এ লেনিন সরণি (মৌলালির সামনে) কলকাতা ৭০০০১৩

বইপাড়ায় পাবেন : কস্পিউট্রনিক্স, বুক ফ্রেন্ড, দে বুক স্টোর-এ

২২৪৪-৫১২৪, ২২২৭-২৩৩৬ • iph@vsnl.net